বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

(নাটক)

ডঃ তাপস অধিকারী

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামপুর কলেজ

১৮৫২ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত বাংলা নাটকের পরিচয়

নাটক হল একটি মিশ্র শিল্পমাধ্যম। একটি নাটকের সফলতার সাথে নাট্যকার, অভিনেত্রা-অভিনেত্রী, রঙ্গমঞ্চ ও দর্শকরা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থাকেন। ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকেই নাট্যসাহিত্যের বিকাশলাভ ঘটেছে। কালীদাস, ভাস, শূদ্রক প্রমুখেরা বেশ কিছু নাটক রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এদের নাটকগুলির মধ্যে অনেকগুলির সেসময় অভিনয়েরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্ত ভারতীয় সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে এই নাট্যশিল্প তার গৌরব হারাতে থাকে। ধীরে ধীরে লোকাভিনয়, লোককথা, যাত্রাগান প্রভৃতি বিনোদনের মাধ্যমগুলি নাটকের জায়গা দখল করে। এগুলির পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মনির্ভর কাব্যের অভিনয়ও মধ্যযুগে জনপ্রিয়তা পায়। কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজরা আসার পর থেকেই নাট্যসাহিত্যের পুনরার্বির্ভাব ঘটে।

ইংরেজ জাতি সম্পর্কে বলা হয় এরা খুব শৌখিন জাতি। ইংরেজরা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যেখানেই যাক, সেখানে একটু থিতু হলেই রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করে বিনোদনের আয়োজন করে। এরা সারাদিন কাজ করার পর রাতে আমোদ করতে ভালোবাসে। এই ইংরেজদের দ্বারাই ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার লালবাজারের উত্তর-পূর্ব কোনে 'প্লে হাউস' নামে একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই থিয়েটারই হল বাংলায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম থিয়েটার। এরপর কলকাতার বুকে ইংরেজরা আরও বেশ কিছু থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে বেশ কিছু নাটকের অভিনয় করেন। এই থিয়েটারগুলি ইংরেজি আদব-কায়দায় তেরি থিয়েটার; এসব থিয়েটারে শুধু ইংরেজি নাটকের অভিনয় হত, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ছিল ইংরেজ এবং দর্শকরাও ছিলেন ইংরেজ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষলগ্নে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে একজন রুশ ভদ্রলোক হেরাসিম (গেরাসিম) লেবেদভের প্রচেষ্টায় 'বেঙ্গলী থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে দু'টি বিদেশি নাটক Disguise এবং Love is the Best Doctor বাংলায় অনুবাদ করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

এইভাবে আধুনিকযুগে বাংলা নাটকের যাত্রা শুরু হলে সেখানে দেশীয় কিছু বিত্তবান লোক নিজস্ব কিছু সখের রঙ্গালয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এই শৌখিন রঙ্গালয়গুলিতে অভিনয় করার জন্য বাংলা নাটকের প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজনিয়তা থেকে আধুনিক যুগে বাংলা নাটকের যাত্রা শুরু। এই যাত্রা শুরু হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। জি. সি. গুপ্তের (ড. সুকুমার সেনের মতে গোবিন্দ চন্দ্র গুপ্ত) 'কীর্তিবিলাস'(১৮৫২) নাটককেই বাঙ্গালী রচিত প্রথম নাটক ধরা হয়। এসময় তিনি ছাড়াও তারাচরণ শিকদার (ভদ্রার্জূন-১৮৫২), হরচন্দ্র ঘোষ (ভানুমতী চিত্তবিলাস-১৮৫৩), রামনারায়ন তর্করত্ন (কুলীন কুল সর্বস্ব-১৮৫৪), কালীপ্রসন্ন সিংহ (সাবিত্রী সত্যবান-১৮৫৮, মালতী মাধব-১৮৫৭, বিক্রমোর্ব্বশী-১৮৫৯), উমেশ চন্দ্র মিত্র (বিধবা বিবাহ-১৮৫৫), মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখেরা বাংলা নাটক রচনা ক'রে খ্যাতি লাভ করেন। এরপর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জনসাধারণের জন্য রঙ্গালয় চালু হলে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে অনেক নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে এবং তাদের রচিত নাটকগুলি দ্বারাই বাংলা নাট্যসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বাংলা নাটকের প্রথম যুগে (১৮৫২-১৮৭২) যারা নাটক রচনা ক'রে বাংলা নাটককে এক স্বতন্ত্রধারাই প্রবাহিত করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তিনজন— রামনারায়ন তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র।

বাংলা নাটক প্রথম যার হাতে বিকাশ লাভ ক'রে তিনি হলেন রামনারায়ন তর্করত্ন। নাটকই তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল জন্য তাঁকে 'নাটুকে রামনারায়ন' বলা হয়। একটি প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য 'কুলীন কুল সর্বস্ব'(১৮৫৪) নাটকটি রচনার মধ্য দিয়ে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। এরপর তিনি লেখেন 'নবনাটক'(১৮৭৫)। এই দু'টি নাটকে তিনি কৌলিন্য প্রথা ও বহুবিবাহের কুফলকে দেখিয়েছেন। রামনারায়ন সংস্কৃত থেকেও কিছু নাটক অনুবাদ করেন। এগুলি হল— 'বেণীসংহার'(১৮৫৩), 'রত্নাবলী'(১৮৫৮), 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'(১৮৫৮), 'মালতী মাধব'(১৮৬৭)। পুরান কথা অবলম্বনে তিনি 'রুক্মীনিহরণ'(১৮৭২), 'কংসহরণ' (১৮৭৫), 'ধর্মবিজয়'(১৮৭৬) প্রভৃতি। তাঁর প্রহসনগুলি হল— 'যেমন কর্ম তেমন ফল', 'চক্ষুদান', 'উভয় সংকট' প্রভৃতি। বাংলা নাটকের প্রথমযুগে রামনারায়ন নাটক রচনা করেছিলেন জন্য তাঁর নাটকগুলি শিল্প রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি একথা সত্য। কিন্তু সেযুগে তাঁর নাটকগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীদের মধ্যে অন্যতম প্রতিভাধর ছিলেন মধুসূদন দত্ত। তিনি বাংলা সাহিত্য 'মহাকবি' নামে পরিচিত হলেও বাংলা নাটক রচনাতেও তাঁর অবদান কম ছিলনা। মাদ্রাজে থাকাকালীন মধুসূদন 'Rizia' নামে একটি ইংরেজি নাটক লিখলেও সেটি ছাপা হয়নি। এরপর ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে পাইকপাড়ার বিদ্যোৎসাহী জমিদার সিংহ ভ্রাতাদের বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ন তর্করত্ন অনূদিত 'রত্নাবলী' নাটকটির অভিনয় দেখার জন্য আমন্ত্রিত হলে মধুসূদন নাটকটি দেখে বাংলা নাটক সম্বন্ধে হতাশ হন। তিনি এ প্রসঙ্গে দুঃখ করে বলেছিলেন—

''অলীক কু-নাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়বঙ্গে
নিরোখিয়া প্রাণে নাহি সহে।''

এই প্রাণে সইছিলনা জন্যেই মধুসূদন মহাভারতের যযাতি-কচ ও দেবজানির কাহিনি অবলম্বনে তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯) নামক পৌরানিক নাটকটি রচনা করেন। এরপর তিনি 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) নামক আর একটি নাটক রচনা করেন। এখানে তিনি অনেকটাই গ্রীক পুরানকে অনুসরণ করেছিলেন। আর কর্নেল টডের 'Annals and antiquities of Rajasthan' গ্রন্থ থেকে কাহিনি নিয়ে 'কৃষ্ণকুমারী'(১৮৬১) নাটকটি রচনা করেন। এখানে মধুসূদন ইতিহাসের কাহিনি অবলম্বনে ট্রাজেডির অবতারনা করেছেন। তাই 'কৃষ্ণকুমারী'-কে ঐতিহাসিক ট্রাজেডি বলা হয়। মধুসূদন ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীকে ব্যঙ্গ করে 'একেই কি বলে সভ্যতা'(১৮৬০) প্রহসনটি এবং সমাজের বহুবিবাহ প্রথাকে ব্যঙ্গ করে 'বুড়ো শালিখের ঘারে রো' (১৮৬১) প্রহসনটি রচনা করেন। এই প্রহসন দু'টি অনেকটাই সামাজিক নাটকের আদর্শে রচিত। এছাড়াও মধুসূদন 'মায়াকানন' নামক একটি নাটক রচনায় হাত দেন, কিন্তু সম্পূর্ণ করতে পারেননি। এভাবে মধুসূদন মাত্র পাঁচটি নাটক রচনা করলেও পরবর্তীকালের নাট্যকারদের জন্য পৌরানিক নাটক, ঐতিহাসিক নাটক, ট্রাজেডি, সামাজিক নাটক এবং প্রহসনের আদর্শ তৈরি করে দেন। এই আদর্শকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালের নাট্যকারেরা সফল হন।

বাংলা নাটকের প্রথমযুগের আর একজন বিখ্যাত নাট্যকার হলেন দীনবন্ধু মিত্র। তিনি পেশায় সরকারী ডাক বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হওয়ায় চাকরীর কারনে বাংলাদেশের সর্বত্র ভ্রমণ করে ব্যপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এই অভিজ্ঞতার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তাঁর রচিত নাটকগুলিতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় নীলচাষকে কেন্দ্র করে ইংরেজ নীলকর সাহেবদের সাথে বাঙ্গালী চাষীদের যে বিরোধ বেঁধেছিল তাকে অবলম্বন করে দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক 'নীলদর্পন'(১৮৬০) রচনা করেন। মধুসূদন এই 'নীলদর্পন'-এর ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন 'The Indigo Planting Mirror' নামে। তবে এটি পাদ্রী জেমস লঙের নামে প্রকাশিত হয়। এই নাটকটি ছাড়াও দীনবন্ধু মিত্র 'নবীন তপস্বিনী'(১৮৬০) এবং 'কমলেকামিনী'(১৮৭০) নামে আরো দু'টি নাটক লেখেন। এছাড়াও তিনি বহুবিবাহ সমস্যাকে নিয়ে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'(১৮৬৬), বাঙ্গালী গৃহস্থ পরিবারে জামাই সমস্যা নিয়ে 'জামাই বারিক'(১৮৬৭) প্রহসন এবং মদ্যপানের সমস্যা নিয়ে 'সধবার একাদশী'(১৮৬৭) প্রহসন রচনা করেন। এর মধ্যে 'সধবার একাদশী' প্রহসনটির নিমচাঁদ চরিত্রটি তার সুখ-দুঃখ, মাতলামির ঝোঁকে হাস্যকর উক্তি ও আচরণের কারনে বাংলা সাহিত্যে একটি স্বরণীয় চরিত্র হয়ে উঠেছে।

এভাবে বাংলা সাহিত্যের প্রথমদিকে বিভিন্ন নাট্যকারের হাতে বাংলা নাট্যসাহিত্যের অগ্রগতি হয়েছিল। ১৮৫২ থেকে ১৮৭২ পর্যন্ত বাংলা নাটকের যে গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল—

প্রথমত:

এযুগের নাট্যকারেরা বেশিরভাগ শখের নাট্যশালার জন্য নাটক রচনা করেছিলেন। তাই বেশিরভাগ নাটকে মনোরঞ্জনের দিকে নাট্যকারদের নজর দিতে হত। যদিও মধুসূদনের সময় থেকে সে ভাবনার পরিবর্তন ঘটে।

দ্বিতীয়ত:

বাংলা নাটকের প্রথম যুগের নাট্যকারদের কাছে সেরূপ কোন আদর্শ ছিল না। তাই নাট্যকারেরা সমাজের নানাবিধ সমস্যা যেমন— কুলীন প্রথা ও তার কুফল, মদ্যপান প্রভৃতিকে নিয়ে সমাজ ব্যঙ্গমূলক রচনার দিকে ঝুকে পরেন।

তৃতীয়ত:

এসময় মূলত সমাজ ব্যঙ্গমূলক প্রহসন জাতীয় নাটক লেখা হলেও নাট্যশাস্ত্র বর্ণিত বিভিন্ন রসের নাটকও বিকাশলাভ করতে শুরু করে। জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস', মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' ট্রাজেডিধর্মী রচনা।

চতুর্থত:

বাংলা নাটকের প্রথমদিকে নাটক রচনার আদর্শ সেভাবে না থাকায় নাট্যকারেরা কাহিনির প্রয়োজনে পুরানের প্রতি ঝুকে পড়েন। তাই এই সময় থেকেই বাংলা পৌরানিক নাটক রচনার সূত্রপাত ঘটে।

পঞ্চমত:

কাহিনির প্রয়োজনে পুরানের পাশাপাশি নাট্যকারেরা ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য দেন। ফলে এসময় থেকে ঐতিহাসিক নাটকের প্রবণতাও দেখা দেয়। যেমন— মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'।

ষষ্ঠত:

আগেই বলেছি এসময় সমাজ ব্যঙ্গমূলক প্রহসনধর্মী নাটকেই নাট্যকাররা স্বচ্ছন্দ ছিলেন। এই প্রহসনের আদর্শকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে সামাজিক নাটক রচনার আদর্শ তৈরি হয়।

এভাবে বাংলা নাটকের প্রথমযুগে কিছু নাট্যকারের চেষ্টায় বাংলা নাটকের বিভিন্নধারার জন্ম নেয়। এরপর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সাধারন রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা হলে রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে প্রচুর নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে। এই সময়কার নাট্যকারেরা পূর্ববর্তী নাট্যকারদের আদর্শ করেন। এই সময়কার নাট্যকারেরা হলেন— অমৃতলাল বসু, উপেন্দ্রনাথ দাস, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রমুখ।

বাংলা নাট্যসাহিত্য দীনবন্ধুর মিত্র

বাংলা নাটকের প্রথমযুগে যে দু'-একজন প্রতিভাবান নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটেছিল তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন দীনবন্ধু মিত্র। মধুসূদন যেমন বাংলা পৌরানিক ও ঐতিহাসিক নাটকের সূত্রপাত করেছিলেন দীনবন্ধু মিত্র তেমনি বাস্তব জীবনচিত্র সম্বলিত সমসাময়িক সমাজ জীবনের উজ্জ্বল আলেখ্য রচনা করে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তাঁর খ্যাতি মূলত 'নীলদর্পন' নাটকটির জন্য। এটি ছাড়াও তিনি আরও বেশ কয়েকটি নাটক ও প্রহসন রচনা করে বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩) নদীয়ার চৌবেরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্যনাম ছিল গন্ধর্বনারায়ন মিত্র। কিন্তু বাল্যকালে তাঁর সমবয়সীরা তাঁকে এইনামে খ্যাপাত বলে তাঁর বাবা এই নাম পরিবর্তন করে রাখেন দীনবন্ধু। প্রথমে গ্রামে এবং পরবর্তীকালে কলকাতার বিভিন্নস্থানে পড়াশুনা করে দীনবন্ধু কর্মজীবনে ইংরেজ সরকারের অধীনে ভারতীয় ডাকবীভাগের উচ্চপদে চাকরি করেন। ব্যস্তকর্ম জীবন সামলানোর পাশাপাশি দীনবন্ধু চাকরি সূত্রে সমগ্র বাংলাদেশ ঘুরে ঘুরে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তাকে সম্বল করে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। এরফলে তিনি 'নীলদর্পন' সহ আর ও বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করে খ্যাতি লাভ করেন।

দীনবন্ধু প্রথম জীবনে ঈশ্বরগুপ্তের 'সম্বাদ প্রভাকর' পত্রিকার পৃষ্ঠায় কিছু কবিতা রচনা করলেও কবিতার ক্ষেত্রে সেভাবে সফল হননি। এসময় তিনি চাকরি সূত্রে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতেন। তখন বাংলায় নীলচাষকে কেন্দ্র করেই ইংরেজ নীলকর সাহেবদের সাথে বাঙালী চাষীদের বিরোধ বেঁধেছিল। সেই বিরোধকে নিয়েই দীনবন্ধু তাঁর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) রচনা করেন। এরপর তিনি 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬০), 'লীলাবতী' (১৮৬৭) এবং 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) নামক তিনটি কমেডিধর্মী নাটক রচনা করেন ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) এবং 'জামাই বারিক' (১৮৭২) নামক তিনটি প্রহসন রচনা করেন। তবে দীনবন্ধুর খ্যাতি মূলত তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকটির জন্য।

আগেই বলেছি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নীলচাষকে কেন্দ্র করে ইংরেজ নীলকর সাহেবদের সাথে বাঙালী চাষীদের যে বিরোধ বেধেছিল তাকে মূলধন করেই দীনবন্ধু তাঁর 'নীলদর্পন' নাটকটি রচনা করেন। এই নাটকটিতে দীনবন্ধুর বাস্তব আভিজ্ঞতা ও সহানুভুতির সার্থক প্রয়োগ আছে। নাটকটির সাথে বাংলা

নাট্যসাহিত্য, নাট্যমঞ্চ, স্বাদেশিকতা, নীল আন্দোলন ও বাংলার সমাজের গভীর যোগ ছিল। নীলকরদের অত্যাচারে স্বরপুর গ্রামের বসু পরিবার ও ঘোষ পরিবার নামক দু'টি পরিবার কিভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তা-ই এই নাটকের মূল উপজীব্য। নীলকরেরা নীলচাষের নামে বাঙালীদের উপর কীরূপ অত্যাচার চালাতেন তার বাস্তব চিত্র এই নাটকে আছে। এই নাটকটি বাংলার সমাজ জীবনে এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে অনেকেই একে মার্কিন ঔপন্যাসিক স্টো রচিত 'Uncle Toms Cabin'- গ্রন্থটির সাথে তূলনা করেন।

'নীলদর্পন' নাটকটি দীনবন্ধু স্বনামে প্রকাশ করতে পারেন নি। তিনি এটি 'কেনাচিৎ পথিকেন' ছদ্মনামে প্রকাশ করেন। এই নাটকটি প্রকাশিত হবার পরেই 'The Indigo Planting Mirror'- নামে মধুসূদন ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। তবে এই অনুবাদটিতেও অনুবাদকের কোন নাম ছিলনা। যাইহোক এই নাটকটি তৎকালীন বাঙালী জনমানসে এতটাই প্রভাব ফেলেছিল যে নীলকরদের অত্যাচারে রাশ টানার জন্য ইংরেজ সরকার ভাবিত হন। নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য ইংরেজ সরকার Indigo Commission বসাতে বাধ্য হন।

বাংলা নাটকের প্রথমযুগের নাটক হওয়ায় দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটিতে অনেক শিল্পগত ত্রুটি ছিল। দীনবন্ধু ট্রাজেডি হিসাবে নাটকটি রচনার পরিকল্পনা করলেও এটি একটি সার্থক ট্রাজেডি হয়ে ওঠেনি। তবুও বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে এই নাটকটি ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এই নাটকটি তৎকালীন বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হয়েছে। ফলে নাটকটির এবং নাট্যকার দীনবন্ধুর জনপ্রিয়তাও অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়েছে।

'নীলদর্পণ' ছাড়াও দীনবন্ধু 'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী', 'কমলে কামিনী' নামক তিনটি কমেডিধর্মী নাটক রচনা করেন। এর মধ্যে 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের জলধর চরিত্রটি শেক্সপীয়ারের 'Merry Wives of Windsor'-এর ফলস্টাফের অনুকরণে অঙ্কিত। এই জলধর আপন ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যে ও কৌতূকরসে দীনবন্ধুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। দীনবন্ধু 'লীলাবতী' নাটকে সমকালীন নাগরিক জীবনের হাস্য পরিহাস ও নায়ক-নায়িকার মিলন সংক্রান্ত এক জটিল কাহিনির উপস্থাপন করেছেন। নায়ক ললিত এবং নায়িকা লীলাবতীর প্রণয়, বিবাহ এই নাটকের মূল ঘটনা হলেও কয়েকটি রংদার উৎকট শ্রেনির চরিত্র এই নাটকের একটি বড়ো সম্পদ। আর 'কমলেকামিনী' নাটকটিতে দীনবন্ধু ব্রহ্মরাজ ও মনিপুররাজের বিরোধ, সংঘাত ও মিলন-এর পটভূমিকায় হাস্যরসের মাধমে কাহিনির অবতাড়ণা করেছেন।

এক 'নীলদর্পণ' ছাড়া অন্য নাটকগুলির ক্ষেত্রে দীনবন্ধু ততটা সফল না হলেও প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে দীনবন্ধু যথেষ্ট সফল। এ ব্যাপারে মধুসূদনকে আদর্শ করে তিনি 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক' ও 'সধবার একাদশী' নামে তিনটি প্রহসন রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনে এক বিবাহ বাতিক গ্রস্থ বৃদ্ধের নকল বিয়ের আয়োজন করে স্কুলের অকাল পরিপক্ক ছেলেরা কিভাবে তাকে নাস্তানাবুদ করেছিল তার কৌতূককর কাহিনির বিবরণ দিয়েছেন। আর 'জামাই বারিক' প্রহসনে তৎকালীন যুগে ধনী পরিবারে ঘরজামাই পোষার প্রবণতাকে হাসি ঠাট্টার মাধ্যমে ব্যঙ্গ করেছেন। অনেকের মতে দীনবন্ধুর এই প্রহসনটির লক্ষ্য ছিল কলকাতার কোন এক প্রসিদ্ধ অভিজাত পরিবার।

তবে প্রহসনের ক্ষেত্রে দীনবন্ধু সবচেয়ে সফল তাঁর 'সধবার একাদশী'-তে। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের আদর্শে রচিত এই প্রহসনটিতে দীনবন্ধু সেযুগের কলকাতার উচ্চশিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের পাণাসক্তি, লাম্পট্য, পরস্ত্রীহরণ প্রভৃতি চরিত্রভ্রষ্টতার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এটি প্রহসন হলেও পুরোপুরি নাটকের রীতিতে রচিত। এরমূল চরিত্র নিমচাঁদ দত্তের সুখ দুঃখ, মাতলামির ঝোকে হাস্যকর উক্তি ও আচরণ এখানে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে অঙ্কিত হয়েছে। এই নাটকের নিমচাঁদ সেযুগের প্রতীক চরিত্র। সেযুগের উচ্চশিক্ষিত ও আদর্শবাদী যুবকেরা কিভাবে সংযমের অভাবে মদের স্রোতে ভেসে যেত তা এই নিমচাঁদের মাধ্যমেই অঙ্কিত।

এভাবে দীনবন্ধু মিত্র বেশ কয়েকটি নাটক ও প্রহসন রচনা করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নিজের স্থান করে নিয়েছেন। 'নীলদর্পণ' সহ তাঁর বেশ কয়েকটি রচনায় ত্রুটি থেকে গেছে। একারনে দীনবন্ধু নানাভাবে সমালোচিত হয়েছেন। তাঁর 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী' আলোচনা করতে গিয়ে অনেকেই বলেন দীনবন্ধু নাকি রুচির মুখ রক্ষা করতে পারেন নি। কিন্তু এ ব্যাপারে দীনবন্ধুর অকৃত্রিম ও অভিন্ন হৃদয় বন্ধু বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—

''তোরপের সৃষ্টিকালে তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে তাহা বাদ দিতে পারিতেন না, নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামি করে তাহা ছাড়িতে পারিতেন না, রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরি, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।''

দীনবন্ধু বেশিকাল জীবিত ছিলেন না। তাই ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

''মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে তাঁর আকালে মৃত্যু হয়, তিনি আর একটু দীর্ঘজীবি হলে বাংলা নাটকের যে কত উন্নতি হত তা আমরা কল্পনাও করিতে পরি না।''

সুতরাং দেখা যাচ্ছে দীনবন্ধু আপন প্রতিভাতেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছেন। তিনি খুববেশি নাটক রচনা করতে পারেন নি, কিন্তু যে কয়েকটি নাটক-প্রহসন রচনা করেন সেগুলি ছিল বাংলা নাটকের প্রথম যুগের সম্পদ। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে যখন বাংলা পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের যুগ শুরু হয় তখন থেকেই দীনবন্ধুর এই নাটক ও প্রহসনগুলি বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। দীনবন্ধুকে আদর্শ করেই অনেকে নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন। তাই বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর অবদান যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একথা মেনে নিতেই হয়।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যপ্রতিভার মূল্যায়ন

বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ(১৮৪৪-১৯১১)। তিনি একাধারে ছিলেন অভিনেতা, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা, নাট্যশিক্ষক এবং বাংলা নাটকের প্রথম যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার। অভিনেতা হিসাবে প্রবেশ করে গিরিশচন্দ্র নাটককেই তাঁর ধ্যাণজ্ঞাণ ও পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি রঙ্গমঞ্চে রাতের পর রাত অভিনয় করে যেমন দর্শকদের মোহিত করে তুলতেন তেমনি দর্শকরুচি ও চাহিদা অনুযায়ী একের পর এক উৎকৃষ্ট মানের নাটক রচনা করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। গিরিশ ঘোষের নাট্য প্রতিভার কারনে তাঁকে তাঁর সমকালের বিখ্যাত ইংরেজ অভিনেতা গ্যারিক এবং বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার শেক্সপীয়ারের সাথে তুলনা করা হত। এই তুলনায় হয়ত কিছুটা অতিশায্য ছিল, তবে অধিকাংশ সমালোচক গিরিশ ঘোষের প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

প্রথম জীবনে অভিনয় পাগল গিরিশ ঘোষের অভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রথমযুগে তিনি বিভিন্ন পুরাতন নাটক রাতের পর রাত চুটিয়ে অভিনয় করেন। কিন্তু একের পর এক অভিনয়ে নাটকগুলি যখন পুরানো হয়ে উঠছিল এবং দর্শকরাও একঘেয়েমিতে ভুগতে শুরু করেছিল তখন রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে গিরিশ ঘোষকে নাটক রচনায় হাত দিতে হয়। প্রথম জীবনে তিনি কিছু গল্প, উপন্যাস, কাব্যের নাট্যরূপ দেন। যেমন— 'কপালকুন্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'মেঘনাদবধ', 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রভৃতি। এরপর তিনি 'আগমনি'(১৮৭৭), 'অকালবোধন'(১৮৭৭), 'মোহিনি প্রতিমা'(১৮৮২), 'স্বপ্নের ফুল'(১৮৯৩), 'অস্ত্রধারণ'(১৯০১) প্রভৃতি গীতিনাট্য রচনা করেন।' (১৯১২)-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'গুরু' (১৯১৮), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৪), 'রক্তকরবী' (১৯২৬), 'মুক্তধারা' (১৯২৬), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২), 'তাসের দেশ' (১৯৩৩)।

তিনি প্রহসন, পঞ্চরং ও কিছু রূপকধর্মী নাটকও রচনা করেন। তাঁর নাটকের সংখ্যা শতাধিক। তবে এগুলির মধ্যে বেশ কিছু তিনি এক রাতের মধ্যেই মঞ্চের প্রয়োজনে রচনা করেছেন, ফলে সেগুলি অনেক সময় শিল্প রসোত্তীর্ণ হতে পারেনি। তবুও নাটক রচনায় তাঁর কৃতিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রায় সবধরণের নাটক রচনা করলেও পৌরানিক নাটক রচনায় সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। গিরিশ ঘোষের পৌরানিক নাটকগুলি হল— 'রাবনবধ' (১৮৮১), 'অভিমূণ্যবধ' (১৮৮১), 'সীতার বনবাস'(১৮৮১), 'লক্ষ্মণবর্জন'(১৮৮১), 'রামের বনবাস' (১৮৮২), 'সীতাহরণ' (১৮৮২), 'পান্ডবের অজ্ঞাতবাস' (১৮৮৩), 'ধ্রুবচরিত্র' (১৮৮৩), 'নল দময়ন্তী' (১৮৮৩), 'কমলে কামিনী' (১৮৮৩), 'শ্রীবৎস চিন্তা' (১৮৮৪), 'বৃষকেতু' (১৮৮৪), 'প্রহ্লাদচরিত্র' (১৮৮৪), 'প্রভাস যজ্ঞ' (১৮৮৫), 'বিষাদ' (১৮৮৮), 'হরগৌরি' (১৯০০), 'তপোবন' (১৯১১) প্রভৃতি। এছাড়াও তিনি এসময়কার হিন্দু পুনর্জাগরণের দ্বারা

প্রভাবিত হয়ে শ্রীচৈতণ্যের প্রতি ভক্তিবশতঃ কিছু ভক্তিমূলক নাটক রচনা করেন। এগুলিকেও তাঁর পৌরানিক নাটকের মধ্যে ধরা হয়। এগুলি হল— 'চৈতণ্যলীলা' (১৮৮৪), 'বিল্বমঙ্গল' (১৮৮৬), 'রূপ সনাতন' (১৮৮৬), 'নসিরাম' (১৮৮৮), 'শঙ্করাচার্য' (১৯০৯) প্রভৃতি। পৌরানিক নাটক রচনার পাশাপাশি গিরিশ ঘোষ ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেও কৃতিত্ব দেখান। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকগুলি হল— 'আনন্দরহ' (১৮৮১), 'চন্ড' (১৮৯০), 'কালাপাহাড়' (১৮৯১), 'ভ্রান্তি' (১৯০২), 'সৎনাম' (১৯০৪), 'সিরাজদৌলা' (১৯০৬), 'মীরকাশিম' (১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজি' (১৯০৭), 'অশোক' (১৯১০) প্রভৃতি। গিরিশ ঘোষের সামাজিক নাটকগুলি হল— 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯), 'হারানিধি' (১৮৯০), 'মায়াবসান' (১৮৯৭), 'বলিদান' (১৯০৫), 'শাস্তি কি শাস্তি' (১৯০৭) প্রভৃতি। আর তাঁর প্রহসনগুলি হল— 'ভোটমঙ্গল' (১৮৮২), 'হীরার ফুল' (১৮৮৪), 'বেল্লিকবাজার' (১৮৮৬), 'বড়দিনের বখশিস' (১৮৯৩), 'সভ্যতার পান্ডা' (১৮৯৩), 'য্যায়সা কি ত্যায়সা' (১৯০৬) ইত্যাদি।

আমরা আগেই বলেছি গিরিশ ঘোষ সবধরণের নাটক রচনা করলেও মূলতঃ পৌরানিক নাটক রচনাতে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি তিনি নিজেই বলেছিলেন—

''হিন্দুস্থানের মর্মে ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।''

এই ধর্মকে আশ্রয় করে তিনি হিন্দু পুরান এবং বিভিন্ন অবতারত্বের কাহিনি অবলম্বনে একের পর এক মঞ্চসফল নাটক রচনা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ সরকার 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন' চালু করলে নাট্যকারদের স্বাধীনতা অনেকটাই কমে গেছিল। হয়ত এই কারনেই গিরিশ ঘোষ সমসাময়িক বিভিন্ন সমস্যাকে উপেক্ষা করে পুরান কথাকে অবলম্বন করে নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। যাইহোক গিরিশ ঘোষের পৌরানিক নাটকগুলির মধ্যে 'রাবনবধ', 'লক্ষ্মণবর্জন', 'সীতার বনবাস', 'সীতাহরণ', 'পান্ডবগৌরব', 'অভিমূণ্যবধ', 'জনা' প্রভৃতি অত্যন্ত মঞ্চসফল হয়েছিল। এর মধ্যে গিরিশ ঘোষের 'জনা' নাটকটিতে ট্রাজেডির বহুল সম্ভাবনা ছিল, তবে শেষ পর্যন্ত এটি ট্রাজেডি হতে পারেনি।

গিরিশচন্দ্রের পৌরানিক নয় অথচ ধর্মকে আশ্রয় করে লেখা নাটকগুলো কোন অংশে কম ছিলনা। তিনি 'বিল্বমঙ্গল' নাটকটিতে কৃষ্ণভক্তির সাথে চিন্তামণি ও বিল্বমঙ্গলের প্রেমকাহিনি জুড়ে দিয়েছিলেন। এই নাটকটি পড়ে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন—

''আমি এরূপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনো পড়িনি।''

আর গিরিশ ঘোষে 'চৈতণ্যলীলা' একটি অত্যন্ত মঞ্চসফল নাটক। এই নাটকটির অভিনয় দেখার জন্য স্বয়ৎ রামকৃষ্ণদেব স্টার থিয়েটারে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন এবং নাটকটি দেখার পর চৈতণ্যরূপী অভিনেত্রী বিনোদিনীকে আশির্বাদ করেছিলেন। এই নাটকে গিরিশ ঘোষ চৈতণ্যদেবকে মানুষ নয়— অলৌকিক শক্তির আধার, ভগবানের অবতার হিসাবে চিত্রিত করেছেন।

গিরিশ ঘোষ পৌরানিক নাটক রচনায় কৃতিত্ব দেখালেও ঐতিহাসিক নাটক রচনাতেও তাঁর অবদান কম নয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলায় যে স্বাদেশিকতার জোয়ার নেমেছিল গিরিশ ঘোষ তা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেননি। নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনের মত একটা আইন থাকায় যেহেতু নাটকে ইংরেজ সরকার বিরোধী কোন কিছু দেখানো যেতনা, তাই গিরিশ ঘোষ ইতিহাসকে আশ্রয় করে সেখান থেকে নানা বীরপুরুষের কাহিনিকে নিজের নাটকে স্থান দিয়ে জাতির কাছে স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এরূপ নাটকগুলি হল— 'সিরাজদৌলা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি শিবাজী', 'অশোক' প্রভৃতি।

গিরিশ ঘোষ সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ইংরেজদের আমলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিভাবে বাংলায় একান্নবর্তী সংসারগুলিতে ভাঙন ধরছিল। পাশাপাশি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের আগে বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলি কিভাবে মানুষের বহু কষ্ঠের সঞ্চয়গুলি আত্মসাৎ করত তাও তিনি লক্ষ্যকরেছিলেন। এই ঘটনাগুলিকে তিনি তাঁর 'প্রফুল্ল' নাটকে স্থান দিয়েছেন। এই নাটকের অভিনয় দেখার জন্য গ্রামগঞ্জের বহু লোক কলকাতায় ভীড় জমাত। পণপ্রথার মত সামাজিক ব্যাধিকে কেন্দ্র করে গিরিশ ঘোষ তাঁর 'বলিদান' নাটকটি লেখেন। এ দু'টি ছাড়াও গিরিশ ঘোষের অপর সামাজিক নাটকগুলি হল— 'হারানিধি', 'শাস্তি কি শাস্তি' 'মায়াবসান' প্রভৃতি।

গিরিশ ঘোষ সমাজ সমস্যাগুলি সম্পর্কে যেমন অবহিত ছিলেন তেমনি এগুলি দূর করতেও সচেষ্ট হন। তাই তিনি বেশ কিছু প্রহসন রচনা করে সমাজের নানা ঘটনাকে ব্যঙ্গ করেছেন। তাঁর প্রহসনগুলি হল— 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'বেল্লিকবাজার', 'বড়দিনের বখশিস', 'সভ্যতার পান্ডা', 'য্যায়সা কি ত্যায়সা' প্রভৃতি।

এভাবে গিরিশ ঘোষ ভিন্ন রুচির ভিন্ন স্বাদের প্রচুর নাটক রচনা করে বাংলা নাট্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। গিরিশ ঘোষের আগে রামনারায়ন তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখেরা নাটক রচনা করে যে ধারার প্রচলন করেন তিনি যোগ্য উত্তরাধিকারীর মত সেই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান। তিনি নিজে অভিনেতা, মঞ্চ পরিচালক ও নাট্যশিক্ষক ছিলেন জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পাশাপাশি দর্শকদের চাহিদাও বুঝতেন। তাই তিনি নাটকে অত্যন্ত দরদ দিয়ে একটার পর একটা চরিত্র সৃষ্টি করতেন। তিনি নাটকে এক ধরণের নতুন ছন্দের প্রবর্তণ করেন যা 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত। গিরিশ ঘোষের এত কিছু প্রয়াসের ফলে বাংলা নটকই উপকৃত হয়েছে। তাই আজও বাংলা নাটকের বিকাশের কথা আলোচনা করতে গেলে অনিবার্যভাবে গিরিশ ঘোষের নাম উচ্চারিত হয়।

মধুসূদন দত্ত থেকে অমৃতলাল পর্যন্ত বাংলা প্রহসন ধারা

প্রহসন হল একধরণের অত্যন্ত লঘু কল্পনাসিদ্ধ, অতিরঞ্জিত, হাস্যচ্ছল নাটক। বাংলাসাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই সমাজ ব্যঙ্গমূলক রচনাগুলির আবির্ভাব ঘটে। এই প্রহসনগুলিতে সে সময়কার নানা সামজিক সমস্যা যেমন— ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর উচ্ছৃঙ্খলতা, বহুবিবাহ, সুরাপান, ইংরেজ আনুকূল্যে গজিয়ে ওঠা নব্যবাবুদের অনাচার-কদাচারকে তুলে ধরা হত। বাংলায় গদ্যের আবির্ভাবের পরপরই কিছু সমাজ ব্যঙ্গমূলক নক্শা জাতীয় লেখার সূত্রপাত ঘটলেও এগুলি থেকে প্রহসন ভিন্ন ধরণের রচনা। প্রহসন মূলতঃ নাটক আকারে লেখা হত এবং বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা হত। বাংলায় প্রহসন রচনার সূত্রপাত ঘটান মধুসূদন দত্ত। এরপর তা দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখদের হাত ধরে এগিয়ে গিয়ে অমৃতলাল বসুর কাছে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। মধুসূদন থেকে অমৃতলাল বসুর সময়সীমাই ছিল বাংলা প্রহসনের স্বর্ণযুগ।

মধুসূদন দত্তের আগেই বাংলা নাটক রচনার সূত্রপাত ঘটলেও তাঁর হাতেই বাংলা নাটক পূর্ণতা পায়। তিনি পুরান কাহিনি অবলম্বনে 'শর্মিষ্ঠা' এবং 'পদ্মাবতী' দু'টি নাটক ও ইতিহাস কাহিনি অবলম্বনে 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটি রচনা করার পাশাপাশি 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘারে রো' নামে দু'টি প্রহসন রচনা করেন। এর মধ্যে 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনে তিনি দেখিয়েছেন তৎকালীন যুগের কিছু শিক্ষিত নবযুবক কিভাবে নিজেদের ইয়ংবেঙ্গল পরিচয় দিয়ে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা চালাতেন। এদের হাতে সাধারণ মানুষের নানা ভাবে নাকাল হওয়ার ঘটনাও এ প্রহসনে স্থান পেয়েছে। আর 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো' প্রহসনে মধুসূদন গ্রাম বাংলার ধর্মধ্বজী বৃদ্ধদের আক্রমণ করেছেন। এখানে তৎকালীন সমাজের সমাজ পতিদের কার্যাবলী, চরিত্র ও নীতি ভ্রষ্টতাকে কৌতূকের মধ্য দিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন। সমাজ সমস্যামূলক মধুসূদনের প্রহসন দু'টি সেকালে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তবে অনেক সময় বিরোধী পক্ষের বিরোধিতার ফলে অনেক জায়গায় এগুলির অভিনয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মধুসূদনের হাতে বাংলা প্রহসনের যে ধারার সূত্রপাত ঘটে তাকে আরো ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যান তাঁর সমসাময়িক কালের অপর নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। মধুসুদনের মত দীনবন্ধুও তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার যে সকল সমস্যাগুলিকে দেখতে পেয়েছিলেন সেগুলিকেই তাঁর প্রহসনে রূপদান করেন। দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনগুলি হল— 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক' এবং 'সধবার একাদশী'।

দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসনে বিবাহ বাতিকগ্রস্থ এক বুড়ার নকল বিয়ের আয়োজন করে স্কুলের অকাল পরিপক্ক ছেলেরা কিভাবে তাকে নাস্তানাবুদ করেছিল তার বিবরণ আছে। আর 'জামাইবারিক' প্রহসনে দীনবন্ধু তৎকালীন ধনীগৃহে ঘরজামাই পোষার প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। তবে দীনবন্ধুর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহসন হল 'সধবার একাদশী'। এটি প্রহসন হলেও অনেকটা নাটক আকারে লেখা। এখানে দীনবন্ধু তৎকালীন কলকাতার উচ্চশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মদ্যপানে আসক্তি, লাম্পট্য, পরস্ত্রীহরণ

প্রভৃতি চরিত্রভ্রষ্টতার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। যদিও 'সধবার একাদশী' প্রহসনটি মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা'র আদর্শে রচিত, তবে তার সাথে এর কিছুটা পার্থক্য আছে। মধুসূদনের প্রহসনটি ছিল যথার্থ প্রহসন, এতে চরিত্রের বিবর্তণ ছিল না। কিন্তু দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' প্রহসন হলেও নাটক আকারে লেখা। এর প্রধাণ চরিত্র নিমচাঁদ। দীনবন্ধু মিত্র অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে এই প্রহসনে নিমচাঁদের সুখ-দুঃখ, মাতলামির ঝোকে হাস্যকর উক্তি ও আচরণের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এই নিমচাঁদ হল সেই যুগের যুবকদের প্রতিনিধি হিসাবে পরিকল্পিত। সেকালের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকেরা কিভাবে নিয়মিত মদ্যপান করে বেসামাল এবং চরিত্রভ্রষ্ট হত— এই প্রহসনের মাধ্যমে দীনবন্ধু তার বাস্তব চিত্র এঁকেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে নাটকের অভিনয় শুরু হলে সেখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি পৌরানিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক নাটক রচনায় ব্যাপক সাফল্যলাভ করলেও রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের করানোর জন্যই বেশ কিছু সমাজ ব্যঙ্গমূলক প্রহসন রচনা করেন। তবে তাঁর প্রহসনগুলি নাটক আকারে লেখা। গিরিশ ঘোষের প্রহসনগুলি হল— 'সপ্তমীতে বিসর্জন', 'বেল্লিক বাজার', 'সভ্যতার পান্ডা', 'য্যায়সা কি ত্যায়সা' প্রভৃতি। এই প্রহসনগুলি তৎকালে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করলেও এগুলির শিল্পমূল্য ততটা ছিলনা।

গিরিশ ঘোষের পর বাংলা প্রহসন রচনায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি হলেন অমৃতলাল বসু। মধুসূদনের হাতে যে প্রহসন রচনার সূত্রপাত ঘটেছিল তা অমৃতলাল বসুতে এসে সর্বাধিক উৎকর্ষ লাভ করে। অমৃতলাল বসুর প্রহসন রচনার সহজাত ক্ষমতা ছিল এবং তিনি দর্শকদের হাস্যকৌতূকে মজিয়ে রাখার জন্য তৎকালীন দর্শকদের কাছে 'রসরাজ' নামে পরিচিতি পান।

অমৃতলাল বসু প্রথমদিকে কিছু নাটক লিখলেও সেগুলি খুব বেশি সাফল্য পায়নি। এরপর তিনি প্রহসন রচনায় হাত দিলে একের পর এক সফল প্রহসন তাঁর হাত দিয়ে বেড়িয়ে আসে। অমৃতলালের 'বিবাহ বিভ্রাট', 'রাজাবাহাদুর', 'খাস দখল' প্রভৃতি প্রহসন তৎকালীন রঙ্গমঞ্চগুলিতে ব্যাপক দর্শকানুকূল্য লাভ করেছিল। এগুলিতে ব্যঙ্গের চাইতে কৌতূকরস বেশি প্রাধাণ্য পেয়েছিল, তাই দর্শকরা মনের আনন্দে এগুলিকে গ্রহণ করেছিল। প্রহসনগুলিতে অমৃতলাল সমাজের বিভিন্ন কাজকে ব্যঙ্গ করেছিলেন জন্য তিনি একশ্রেণির লোকেদের কাছে যেমন প্রচুর সমাদর পেয়েছিলেন, তেমনি অন্য সম্প্রদায়ের কাছে তাঁকে প্রচুর নিন্দা বিদ্রুপ সহ্য করতে হয়। তাঁর প্রহসনগুলির কষাঘাত থেকে ব্রাহ্মসমাজ ও তার রীতিনীতি, বিলেত ফেরতা ইঙ্গ-বঙ্গ সম্প্রদায়, রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ, স্ত্রী স্বাধীণতার বাড়াবাড়ি, মিউনিসিপ্যাল ভোটরঙ্গ, শূণ্যগর্ভ স্বদেশী আন্দোলন প্রভৃতি কিছুই বাদ যায়নি। এই বিষয়গুলি নিয়ে লেখা তাঁর কয়েকটি প্রহসন হল— 'একাকার', 'কালাপানি', 'অবতার', 'বাবু' প্রভৃতি। অমৃতলালের 'কৃপণের ধন', ও 'চাটুজ্যে বাঁড়ুয্যে' প্রহসন দু'টিতে ব্যঙ্গের ঝাঁঝ কিছুটা কম ছিল জন্য এগুলি অনেকটাই উপভোগ্য হয়েছে।

যাইহোক অমৃতলাল নাটক ছেড়ে প্রহসন রচনায় হাত দিয়েছিলেন জন্য বাংলা প্রহসনের ধারাটি সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রহসনে তিনি বাঙ্গালী সমাজের নানা অনাচার ও ত্রুটি বিচ্যুতিকে আক্রমণ করলেও এগুলি থেকে মনে হয় তিনি সমাজ সংস্কার ও রাজনৈতিক ব্যাপারে কিছুটা রক্ষণশীল ছিলেন। অমৃতলাল ইংরেজ অনুকরণকারী এবং ব্রাহ্মদের প্রহসনের মধ্য দিয়ে বেশি করে আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর কিছু দৃষ্টিভঙ্গীগত গোঁড়ামি বাদ দিলে তাঁর মত তীব্র, বিদ্যুৎ কষাঘাত, বাকভঙ্গীর সহজ সরলতা ও নাটকীয়ভাবে কাহিনির অবতাড়না আর অন্য কোন বাংলা প্রহসনে দেখা যায়না।

এভাবে মধুসূদনের হাতে বাংলা প্রহসনের যে ধারার সূত্রপাত ঘটেছিল অমৃতলাল বসুতে এসে তা সম্পূর্ণতা পায়। হয়ত এই প্রহসনগুলির খুব বেশি সাহিত্যিক মূল্য ছিলনা। কিন্তু এগুলিতে তৎকালীন সমাজের বহু বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই সমকালীন সমস্যা নিয়ে রচিত এই প্রহসনগুলি সমকালীন যুগকে অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্যে আজও তাদের তাৎপর্য বহন করে চলেছে। এখনও অনেক বাঙালী ঐতিহাসিক ঊনবিংশ শতাব্দীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিহাস লিখতে বসে এই প্রহসনগুলির দ্বারস্থ হন। এই প্রহসনগুলিতে নতুনভাবে রূপদান করে এখনও বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করা হয়। তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকালে মধুসূদন থেকে অমৃতলাল পর্যন্ত বাংলা প্রহসনের ধারাকে অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক

বর্তমানে রূপক-সাংকেতিক নাটক নামে নাটকের একটি প্রকরণের কথা বলা হলেও রূপক ও সংকেত কথা দু'টি এক নয়। রূপক বলতে আমরা সেই ধরণের কাহিনিকে বুঝি যার আপাত একটি কাহিনি ভিতরে একটি গভীর তাৎপর্যবাহী কাহিনি লুকিয়ে থাকে। আর সংকেত হল কোন চিহ্ন বা প্রতীকের দ্বারা কোন বিষয় সম্পর্কে ব্যঞ্জণাকে ফুটিয়ে তোলা। তবে সাহিত্যিকরা বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একই নাটকে রূপক কাহিনির অবতাড়ণা করে তার মধ্যে নানা সংকেত ব্যবহার করেছেন জন্য সেই নাটকগুলিকে একসাথে রূপক-সাংকেতিক নাটক বলা হয়। তবে বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আগেই ইয়েটস, মেটারলিঙ্ক, স্টিন্ডবার্গ, হুইপ্টম্যান প্রমুখেরা রূপক-সাংকেত নির্ভর নাটক রচনা করে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। মূলতঃ এদের অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা ভাষায় বেশ কয়েকটি রূপক-সাংকেতিক নাটক রচনা করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুমূখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর প্রধাণ পরিচয় কবি হিসাবে হলেও বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য, বাংলা উপন্যাস, বাংলা ছোটগল্প, বাংলা গান প্রভৃতি প্রকরণেও সমানভাবে পদচারনা করার পাশাপাশি বাংলা নাটকেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন। প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য রচনার পর বেশ কয়েকটি নিয়মানুগ নাটক ও ব্যঙ্গকৌতূক নাটক রচনা করেছিলেন। তবে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির জন্য। রবীন্দ্রনাথ যে সকল রূপক-সাংকেতিক নাটক লিখেছেন সেগুলি হল— 'শারদোৎসব' (১৯০৮), 'রাজা' (১৯১০),-এর অভিনয়যোগ্য সংস্করণ 'অরূপরতন' (১৯২০), 'অচলায়তন' (১৯১২)-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'গুরু' (১৯১৮), 'ডাকঘর' (১৯১২), 'ফাল্গুনী' (১৯১৪), 'রক্তকরবী' (১৯২৬), 'মুক্তধারা' (১৯২৬), 'কালের যাত্রা' (১৯৩২), 'তাসের দেশ' (১৯৩৩)।

বোলপুর আশ্রমে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে শারদোৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শারদোৎসব' নাটকটি রচনা করেন। এই নাটকটিতে ঋণশোধের পটভূমিকায় প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের মিলন সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে রাখালী ধরণের পটভূমিকায় বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে। তবে অনেকের মতে 'শারদোৎসব' নয়, 'রাজা' নাটক থেকেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত রূপক-সাংকেতিক নাটকের যাত্রা শুরু। বৌদ্ধ কুশজাতক থেকে কাহিনি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করে ধ্যাণগম্ভীর পরিবেশ ও নিগুঢ় আধ্যাত্মিক সংকেতের সাহায্যে নাটকটি রচনা করেছেন। ভগবানকে রূপের মধ্যে পাওয়া যায়না, সীমাবদ্ধ প্রতীকের মধ্যে তিনি ধরাছোয়ার বাইরে থেকে যান, যে সীমাবদ্ধ রূপের মাঝে অরূপকে পেতে চায়, অবশেষে চোখের জলের মধ্যে তাঁকে পেতে হয়— রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বই এই নাটকটিতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। এ নাটকের চরিত্ররা হল— অন্ধকার ঘরে বদ্ধ রাজা, রানী সুদর্শনা, ঠাকুরদা, সুরঙ্গমা প্রভৃতি। 'রাজা' নটকের ইংরেজি অনুবাদ 'The King of Dark Chamber' সারা বিশ্বে সাফল্যের সাথে অভিনীত হয়।

প্রাচীন কালের তন্ত্রমন্ত্রের পটভূমিকায় প্রথা ও সংস্কারের চাপে কিভাবে মনবাত্মার স্বাধীন প্রকাশের বিলোপ ঘটে এবং তা থেকে মুক্তিলাভ করা যায় রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন তাঁর 'অচলায়তন' নাটকে। এই নাটকে দেখা যায় এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কিভাবে বিভিন্ন রীতি সংস্কার দ্বারা শিক্ষার্থীদের মনের স্বাধীণ বিকাশকে অবরুদ্ধ করে রাখা হচ্ছিল। সেখানেই মুক্তির বাণী নিয়ে হাজির হয় পঞ্চক। এই পঞ্চকের কারনেই শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা তাদের আত্মার মুক্তির সন্ধান পায়।

রূপক-সাংকেতিক নাটকের ধারায় রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'ডাকঘর'। এই নাটকটি 'The Post Office'-নামে সারা বিশ্বে সাফল্যের সাথে অভিনীত হয়েছে। এখানে রূপকের আড়ালে ঈশ্বরের সাথে মানবাত্মার মিলনের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। নাটকটির প্রধাণ চরিত্র অমল ব্যাধিতে শয্যাগত, সে ঘরের বন্ধণ ছিঁড়ে বাইরে বেড়িয়ে পরতে চায়; কিন্তু তা আর সম্ভব হয়না। শয্যাশায়ী অমলের সাথে ভিন গাঁয়ের দইওয়ালা, ছেলের দল ও সুধার সাক্ষাৎ হয়। এসময় রাজার 'ডাকঘর' বসলে অমল ভাবে সকলের মত রাজা তার নামেও চিঠি পাঠাবে। এই কারনেই সে চিঠির প্রতীক্ষা করে। শেষ পর্যন্ত অমলের কাছে রাজার

ডাক আসে এবং সে ডাকে সারা দিয়ে সে সীমাকে ত্যাগ করে অসীমের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়, আর মর্তে পড়ে থাকে তার স্মৃতি। এই নাটকের রাজা হলেন ঈশ্বর। ছেলের দল, দইওয়ালা, সুধারা হল মর্তজীবনের প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমলের মধ্য দিয়ে মানুষের চিরন্তন আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দেখিয়েছেন। তত্ত্বকথাকে বাদ দিলেও এই নাটক অপূর্ব কাব্যরস ও শিল্প কল্পনার এমন একস্তরে উঠেছে যে, যে কোন শিশুকেন্দ্রিক সাহিত্যে এর জুড়ি মেলা ভার।

প্রমথ চৌধুরীর সুযোগ্য সম্পাদনায় 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশিত হলে সেই পত্রিকার পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটকটি প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই নাটকে প্রকৃতি আর মানুষকে একসাথে নিয়ে এসেছেন। জীবন ও মৃত্যু, শীত ও বসন্ত, জড়া ও যৌবণের দ্বৈত সত্তার পারস্পরিক সম্পর্কের পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এখানে এক নতুন ঋতুনাট্যের পরিকল্পনা করেছেন। একদল তরুন চন্দ্রহাস যাদের নেতা, পণ করেছিল গুহার মধ্যে আত্মগোপনকারী জড়া বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে আসবেন। বহু প্রয়াসের পর গুহার ভেতর থেকে যখন সেই বৃদ্ধকে ধরে নিয়ে এল, তখন দেখা গেল এত বৃদ্ধ নয়, জড়া নয়, শীত নয়, রিক্ততা নয়, এ হচ্ছে তাদেরই সর্দার , যৌবণের প্রতীক, বসন্তের প্রতীক ও পূর্ণতার প্রতীক। বাইরে থেকে, দূর থেকে দেখলে যাকে জড়া-বৃদ্ধ বলে মনে হয় আসলে সে যে যৌবণের প্রতীক এই তত্ত্ব কথাটি 'ফাল্গুনী' নাটকের মূল কথা।

এরপর রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'রক্তকরবী' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ভাবতেন আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা কখনোই মানব সভ্যতার স্থান নিতে পারেনা। এই নাটকে যন্ত্র সভ্যতার সাথে কৃষি সভ্যতার বিরোধ দেখিয়ে এই তত্ত্বটির অবতাড়না করা হয়েছে। নাটকটির পটভূমি হল পাতালপুরি অর্থাৎ যক্ষপুরী। সেখান থেকে শ্রমিকেরা রাজার জন্য তাল তাল সোনা সংগ্রহ করে। এখানে আবির্ভাব ঘটে প্রাণশক্তির প্রতীক নন্দিনীর। নন্দিনীর সংস্পর্শে এসে রাজার মধ্যে আমূল পরিবর্তণ ঘটে। যখন রাজা জানতে পারেন তারই অগোচরে যৌবণের প্রতীক নন্দিনীর প্রেমিক রঞ্জন মারা গেছে তখন রাজা নিজেই তার জালের আবরণ ভেদ করে বাইরে এসে নিজের তৈরি ধ্বজদ্বন্ড ভাঙতে যায়। এসময় তার বাঁধা হয়ে দাঁরায় তার নিজেরই তৈরি সমাজ ব্যবস্থা। এ নাটকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার বাস্তব প্রতিফলন ঘটিয়েছেন।

যন্ত্রসভ্যতা যে মানুষের স্বাভাবিক জীবন প্রবাহকে কখনো আটকে রাখতে পারেনা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মুক্তধারা' নাটকে অভিজিৎ দ্বারা রাজা রণজিতের ইঞ্জিনিয়ার বিভূতি নির্মিত মুক্তধারাকে অবরুদ্ধ করার জন্য তৈরি বাঁধকে ভেঙে তা দেখিয়েছেন। 'মুক্তধারা' রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত রূপক-সাংকেতিক নাটক।

'কালের যাত্রা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন মহাকালের যাত্রা অর্থাৎ জীবন সত্তার বিকাশ তখনই ব্যহত হয় যখন সমাজের অপাঙতেয়, অচ্ছুৎগণ পঙ্কস্তরে ডুবে থাকে।

এভাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একের পর এক তত্ত্বমূলক রূপক-সাংকেতিক নাটকে তাঁর নানা ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন। নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ মানবজীবনের চাওয়া পাওয়া গুলিকে, আধুনিক সভ্যতার বাস্তব রূপকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে এগুলি বিশ্বের যে কোন রূপক সাহিত্যের সমগোত্র হয়ে উঠেছে। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' আর 'রক্তকরবী' নাটক দু'টি অসাধারণ সৃষ্টি। এদের তুলনা বিশ্ব সাহিত্যে বিরল। অনেক সমালোচক রবীন্দ্রনাথের এই ধরণের নাটকগুলির সমালোচনা করে বলেন যে এগুলি কাব্যের জলাভূমি হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই সমালোচনা মেনে নেওয়া যায়ন, কারন তত্ত্ব ও কাব্য সাহিত্যেরই অংশ। এগুলির মিশ্রণেই উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকে এর যথার্থ সংমিশ্রণ ঘটাতে পেরেছিলেন জন্য নাটকগুলি কালজয়ী হয়ে উঠেছে। এখনও পাঠক-গবেষকরা তাঁর রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি পড়ে আপ্লুত হন এবং নতুন নতুন তত্ত্ব খোঁজার চেষ্টা করেন। সাহিত্যিক হওয়ার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ যে একজন দার্শনিকও ছিলেন এই রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি তাঁর প্রমাণ বহন করে।